95

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08.OCT.1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে বসে টোকাইদের পাঠশালা

আফরোজা নাজনীন

মা কোথায়?

– জানি না। ছোট্ট সাবুর উত্তর।

– বাবা?

ওর চোখেই তখন হাজারো জিজ্ঞাসা। বাবা কে? বাবা কেমন? সকালে উঠে স্টেশনের কলে মুখ ধোয় সাবু। রেল লাইনের পাশে প্রাকৃতিক কর্ম সারে। হাতের কাছে পানি থাকলে ব্যবহার করে, নতুবা কাগজ ব্যবহার করে। তারপর বের হয় কাগজ কুড়িয়ে নিতে। কাগজ টুকিয়ে যা পায় তা, দিয়েই নাস্তা করে পাশের হোটেলে। ভাজি-রুটি নাস্তা খেয়ে স্কুলে আসে। অ, আ, ক, খ ১, ২, ৩, ৪ সব শেখে। স্কুলটার চারিদিকে দুর্গন্ধ। উপচে আসে বমি। তারই মধ্যিখানে সিমেন্টের বাঁধানো বারান্দায় ওরা পড়ে চলেছে অ, আ, ক, খ। ওরা বিল্লাল, কাসেম, বাবু, বেলায়েত। ওরাই ওদের পরিচয়। ওদের কয়েকজন বাদে কেউ জানে না বাবা-মা কোথায়। এই স্কুলের একজন শিক্ষার্থী কাশেম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছেলে। দেখতে লম্বা . . .। য়েন ও হঠাৎ করেই বড় হয়ে গেছে। মাথায় চুল খুব কম। মুখের রং কিছুটা শ্যামলা হলেও হাত পা একদম কালো। পরনে টাইট হাফ প্যান্ট, ও ঢোকা সাদা শার্ট। যার রং এখন হয়ে গেছে একেবারে গাছের রং-এর মত বাদামী।

কাশেম ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এসেছে তিন বছর আগে। বাবা মারা যাওয়ার পর আর কোন গতি ছিল না। তাই কাশেম পা বাড়ায় ঢাকার পথে। বাবা ছিলেন বর্গাচাষী। তিনি মারা যাওয়ার পর আয়ের সব পথ রোধ হয়ে যায়। কাশেমের বয়স তখন ৮ বছর। শিশু কাশেমের জন্য গ্রামে কোন কাজ নেই। ঢাকায় কমলাপুর স্টেশনে কুলিগিরি করে কাশেম। যা পায় তা দিয়ে ওর চলে যায়। হিসাবে একেবারে পাক্কা। নাস্তায় তিন টাকা। ভাত ছয় টাকা মাছসহ। কাশেম টাকা বাঁচিয়ে মাকে প্রতি মাসে ৩০০ টাকা পাঠায়। বাড়িতে ওর ভাই পড়াশোনা করে ক্লাসটুতে। কাশেমের ইচ্ছা কমলাপুর স্টেশনের এ স্কুল শেষে মোটর মেকানিক শেখার।

এ স্কুলটি পরিচালনা করছে টিডিএস নামে একটি সংস্থা। এদের সদর দফতর সুইজারল্যান্ডে। কমলাপুর ছাড়াও সদরঘাট টার্মিনালে এমন দুটি স্কুল খোলা হয়েছে ১৯৯১ সালে।

কমলাপুরের এই স্কুলে চারজন শিক্ষক, সবাই থাকেন আশপাশের এলাকায়। সবাইবিএ পাস। দু'জন এখনো পড়ছেন। স্কুলে শিক্ষার্থী আছে ৪০ জন। ক্লাস হয় ৯টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত। এখানে সাধারণত অংক ও বাংলা শেখানো হয়। আর শেখানো হয় ছবি আঁকা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। ছোটখাট ধরনের আহত হলে এখানে স্যাভলন বা ডেটল দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এখানে টোকাইদের বেতন দিতে হয় না।

স্কুলের একজন শিক্ষক জানালেন, এখানে আগে ময়লার স্তূপ ছিল। কমলাপুর 'স্টেশনের সব ময়লা এখানে এনে জমা করা হতো। দুর্গন্ধ ও মাছি ছাড়া এ জায়গাটির আর কোন বিশেষত্ব ছিল না। অথচ জায়গাটির অবস্থান খুব ভাল। দুদিকে দেয়াল। মাথার উপরে ছাদ। রোদ বা বৃষ্টি কোনটাই গায়ে লাগে না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে স্কুল খোলা হয়েছে। রাতে এখানে সেখানে টোকাই ছেলেমেয়েসহ অসংখ্য ভাসমান মানুষ ঘুমায়। যেসব মানুষের ঢাকায় কোন আবাস নেই। দেশের প্রতিটি জেলার কোন না কোন মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে রাতের এ কমলাপুরে। অনেকে জানে না, খবরও রাখে না তার পাশে যে মানুষটি ঘুমুচ্ছে তার বাড়ি কোথায়। কেউ জানে না কার নাম কি। এরা কেউ কাগজ টুকায়। কেউ ঠেলা চালায়। কেউ চালায় রিকশা। কেউ মেসে মেসে রান্না করে। কিন্তু কারো

(১১ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 08.OCT.1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

(৯-এর পৃঃ পর) স্টেশনের প্ল্যাটফরমে বসে

কাজই নিয়মিত নয়, স্থায়ী নয়। ওদের ভাষায় "বাধা কাজ" নয়, তাই ওরা বাসা ভাড়া নিতে পারে না। হাজার হাজার নারী–পুরুষ অবলীলায় শুয়ে থাকে কমলাপুরের এ চত্বরে। এরা স্বপ্ন দেখে – ,কোনদিন আবারো তাদের ঘর হবে।

স্কুলের ছেলেমেয়েরা রোজ ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করে। তারপর শুরু করে পড়াশোনা। কচিকণ্ঠের তম–তম সুরে মিলিয়ে যায় জীবনের দুঃস্বপ্নের রেশ। স্কুলে শিক্ষার্থীদের শ্লেট–পেন্সিল দেয়া হয়। ক্লাস স্কুল শেষে প্রতিদিন কমলাপুর স্টেশনের একটি কক্ষে বইপত্র তালা মেরে রাখা হয়। এ স্কুলে কোন ছাত্রী নেই। প্রথম প্রথম দুএকজন আসতো। কিন্তু কয়েকটি মেয়ের ওপর দুঃস্কৃতকারীদের হামলা হবার পর এরা এখন আর আসে না। যদিও এখানকার শিক্ষকরা খুব সচেতনভাবে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দেন। তবু মাঝে মাঝে জীবনের কঠিন টানা-পোড়নে কেউ কেউ হয়তো তা মনে রাখতে পারে না। মিথ্যা বলবে না। অপরের ধন চুরি করা মহাপাপ। প্রতিদিন এই কথা শোনার পরও হয়তে ক্ষুধার জ্বালায় কেউ, কেউ ছোটখাট আবদার করে ফেলে। তবে এটা যে অন্যায় ওরা তা স্বীকার করেছে। এই যে সত্য স্বীকারের মনোবৃত্তি এটাই তৈরী করে দিয়েছে – স্কুল কর্তৃপক্ষ।

স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকারা জানিয়েছেন – এরা জীবনের যে স্তর থেকে উঠে এসেছে। যে কষ্টকর জীবন যাপন করে সে তুলনায় এরা মেধাবী। খুব অল্পতেই এরা তৃপ্ত করতে পারে। একেবারে মাথামোটা খুব কম ছেলেই রয়েছে এবং এদের সবচেয়ে আকর্ষণ ছবি আঁকতে। এদের আঁকা ছবি দেখলে আনন্দে বিস্ময়ে বলতেই হবে সত্যি এইতো বাংলাদেশের শান্ত স্নিগ্ধ ছোট গ্রাম।

তবে শিক্ষকরা প্রধানত যে সমস্যাটির মুখোমুখি হন তা হলো – প্রথম থেকেই এদেরকে স্কুলের গন্ডিতে টেনে আনার ব্যাপারটা। তাদের মধ্যে একটা ভয় রয়েছে – পড়াশোনা মানেই খুব কঠিন কাজ। স্কুল মানেই শিক্ষকের রক্তচক্ষু। কিন্তু যদি একবার তাদের এ স্কুলের ভেতর টেনে আনা যায়, বই হাতে তুলে নেয়া যায়, এরা তাহলে একেবারে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ে। যাতে অন্য দশটা সাধারণ স্কুলের ছাত্রের মতই একাগ্রতা থাকে। অর্থাৎ একবার লেখাপড়ার . . . . ধরিয়ে দিতে পারলে আর সুর ছিঁড়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

এই স্কুলের আর এক ছাত্র বিল্লাল। বাবার নাম নূর ইসলাম মা নেই। বাবা কুলি। বিল্লালের এখানে পড়তে ভাল লাগে। কেন লাগে?

– পড়ালেহা কইর‍্যা বড় হমু – ওর উত্তর। বিল্লালের পরণে একটা ময়লা শার্ট ও প্যান্ট, দাঁত মাজেনি। চোখে পিঁচুটি। তা নিয়েই স্কুলে এসেছে। দাঁত মাজোনি কেন?

– তার উত্তরে বিল্লাল জানায় পানি পামু কই? স্টেশনের পানির কল বন্ধ। কলের পানি গেছে গা। বিল্লাল পড়ালেখার শেষে ট্রেনের সীট মোছে। তা থেকে দিনে ১০/১২ টাকা আয় হয়।

সাত বছরের বিল্লাল, পোকায় খাওয়া ফোকলা দাঁত। ক্লাবে টেলিভিশন দেখে। হলে যেয়ে দেখে সিনেমাও।

বিল্লাল মিছিলে যায়। পুলিশের মার খায়। ও শেখ হাছিনা ও খালেদা জিয়াকে দেখেছে দূর থেকে। চেনে। এবার শিশু দিবসে ওরা মিছিল করে ওসমানী মিলনায়তনে যায়। কিন্তু ওদের ঢুকতে দেয়া হয়নি, ওদের পরণে নোংরা কাপড় ছিল তাই। এ বিষয়টি বিল্লালকে খুব দুঃখ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ কিছুই বলতে পারে না। মা কে? বাবা কে? কিছুই বলতে পারে না। স্কুল শেষে প্রতিদিন ভিক্ষা করে ১০/১৫ টাকা পায়। খুব নোংরা একটা জামা পড়া, আবদুল্লাহর ধারণা ওর জামাটা খুব সাদা–সফেদ। আবদুল্লাহ নিজের এই হতছাড়া জীবন নিয়ে খুশী। জীবনটা এমন না হলে ও ভিক্ষা করতে পারতো না আর প্রতিদিন ১০/১৫ টাকা পেত না।

এই স্কুলের পাঠ চুকিয়ে টোকাইরা যায় নয়াবাজার। এখানে থাকার ব্যবস্থা আছে। টোকাইদের নিজেদের টাকা পয়সা যোগাড় করে খেতে পড়তে হয়। ১৯৯০ সালে ঢাকার নয়াবাজারের টিডিএস চালু করে ড্রপ–ইন–সেন্টার। তবে এটি শুধু দিনের বেলা খোলা থাকে। এই সেন্টারে পরিবার বিচ্ছিন্ন ও নাগরিক সুবিধাহীন শ্রমিক শিশুরা এসে গোসল করে কাপড় কাচে, রান্না করে খায়। এখান থেকে ছিন্নমূলদের জায়গা হয় ক্লাবে। আরামবাগে ক্লাব এবং মিরপুরে আছে দুটি ক্লাব। ছিন্নমূল শিশুরা এই ক্লাবে আসা যাওয়া করে। রান্না করার জন্য তৈজসপত্র, টাকা পয়সা সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তিগত লকার, এবং বিছানা হিসাবে কাঠের চৌকি ছাড়াও সকালবেলা বিনামূল্যে এককাপ চা ও হাল্কা নাস্তা তারা পেয়ে থাকে। এছাড়া ঢাকায় কাওরানবাজারে মেয়েদের একটি হোস্টেল রয়েছে ইউসেপ পরিচালিত স্কুলে তারা পড়াশোনাও করে। হাতের কাজ শেখে। লেখাপড়ায় প্রত্যেকেই মনোযোগী। একথা জানালেন স্কুলের একজন শিক্ষক।